প্রথম আলো

কলাম

মতামত

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ: ‘রিকমেন্ডেশন’ লেটার কেন ‘তদবির’ হয়ে ওঠে

নাদিম মাহমুদ
লেখক ও গবেষক

আপডেট: ০৬ আগস্ট ২০২৫, ২২: ৪৭

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিভাগের শিক্ষক নিয়োগে এক প্রার্থীর প্রবেশপত্র ভুলবশত বিশ্ববিদ্যালয়টির সহ-উপাচার্য ফরিদ খানের ফেসবুকের ‘স্টোরিতে’ চলে এসেছে। সহ-উপাচার্যের দাবি, তাঁর ছেলে মুঠোফোন খেলার ছলে ওই প্রার্থীর ‘প্রবেশপত্র’ চলে আসে, যার জন্য তিনি ‘ক্ষমা প্রার্থনা’ করেন।

তবে বিষয়টি এখানেই শেষ হয়নি, এই প্রবেশপত্রে এক রাজনৈতিক দলের সাবেক সংসদ সদস্যের নাম ও জেলার নাম হস্তাক্ষরে স্বাক্ষর করা হয়েছে, যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেকে বলছে, সহ-উপাচার্যের এই 'ভুলবশত' আপলোড অভ্যুত্থান-পরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে আনছে, বিশেষ করে 'তদবিরচর্চা' আগের মতো আছে। অরাজনৈতিক সরকারের সময়ে রাজনৈতিক সুপারিশ ঠিক কতটা কাজে লাগছে, তা সময় বলে দেবে, তবে আপাতত এই আলোচনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগে 'সুপারিশনামা' প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক।

আমাদের দেশে সবার ধারণা থাকে, কারও নামে সুপারিশ করা মানে খারাপ বা অসৎ উদ্দেশ্যে চাকরি/নিয়োগে প্রভাব বিস্তার করা। প্রার্থীর যোগ্যতা থাকুক না থাকুক, এমন সুপারিশনামা পাওয়ার পর 'নিয়োগকর্তা'রা সেই সুপারিশকারীর ওজন মেপে সিদ্ধান্ত নেন, চাকরি দেন কিংবা দেওয়ার সুযোগ করে দেন। এই বহুল চর্চিত বিষয়টি আমাদের দেশে 'স্বজনপ্রীতি' একটি বড় অনুষঙ্গ।

কয়েক দশক ধরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক নিয়োগে দেশের মন্ত্রী, এমপি, স্থানীয় প্রভাবশালীদের সুপারিশ জোগাড় করা 'প্রার্থীদের' যোগ্যতা হিসেবে দেখা হয়। একাডেমিক যোগ্যতা যেটাই থাকুক না, ক্ষমতাশালীদের এমন সুপারিশে যে কাজ হয়, তার নিদর্শন শত শত আছে। সম্ভবত এসব কারণে গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশে বিপুলসংখ্যক মানুষ চাকরি হারিয়েছেন, মূলত আগের সরকারের সুপারিশে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে।

প্রশ্ন সেটা নয়, সারা বিশ্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ভর্তি থেকে শুরু করে পোস্টডক, গবেষক এবং শিক্ষক নিয়োগে রিকমেন্ডেশন বা সুপারিশপত্র থাকা, সেই সব নিয়োগের যোগ্যতার বা আবেদনের অন্যতম শর্ত। এই শর্ত পূরণ প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য জরুরি। কারণ, এমন রিকমেন্ডেশন ওই প্রার্থীর যোগ্যতা নিরূপণের একটি বড় হাতিয়ার হিসেবে ধরা হয়। তাই একাডেমিক সনদের পাশাপাশি আবেদনপত্রে 'রেফারেন্স' হিসেবে তিন-চারজনের নাম উল্লেখ করতে হয়, যা পরবর্তী সময়ে নিয়োগ বোর্ড ওই প্রার্থীর জন্য তাঁদের কাছ থেকে সুপারিশপত্র সংগ্রহ করে।

প্রার্থীর জন্য কারা কারা সুপারিশ করবেন, তার কিছু শর্তও দেওয়া থাকে। যেমন প্রার্থীর পিএইচডি তত্ত্বাবধায়ক, তাঁর সর্বশেষ কর্মস্থলের তত্ত্বাবধায়ক/নিয়োগকর্তা কিংবা প্রার্থীর সঙ্গে কাজ করেছেন, এমন ব্যক্তি যিনি তাঁকে ভালো করে জানেন। এসব সুপারিশের ওপর নির্ভর করে সেই প্রার্থীর মৌলিক গুণাবলি। কারণ, দেশের বাইরে যাঁরা সুপারিশপত্র লেখেন, তাঁরা মূলত প্রার্থীর বিষয়ে সততার সঙ্গে লেখেন। ফলে দেশের বাইরের শিক্ষক নিয়োগে এমন সুপারিশনামা বড্ড বেশি কাজের হয়ে থাকে। আর এটাই সর্বজনীন নিয়ম।

কিন্তু এই আদর্শিক নিয়ম বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজন হলেও আমাদের দেশের শিক্ষক নিয়োগের 'বিজ্ঞপ্তিতে' এমন সুপারিশপত্র চাওয়ার কোনো নজির দেখিনি। তবে আবেদনপত্রের সঙ্গে সেঁটে দেওয়া এমপি/মন্ত্রী/মেয়র কিংবা সচিবদের সুপারিশনামার ওপর ভর করে প্রার্থী বাছাইয়ের দুর্লভ নিয়োগ আমাদের দেশে বছরের পর বছর ধরে চলে আছে। যাদের সঙ্গে ন্যূনতম যোগাযোগ নেই, যে প্রার্থীকে কোনো দিন দেখেনি, সেই প্রার্থীর হয়ে

লিখে, আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি, তিনি অমুক আদর্শের লোক, আপনি তাঁর বিষয়টি দেখতে পারেন, এই সব কথা বলে উপাচার্য বরাবর চিঠি দেয় মূলত প্রার্থীর কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়ে।

সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, একাডেমিক নিয়োগে প্রার্থীর সঙ্গে ওই সুপারিশকারীরা না করেছে একাডেমিক কাজ, না করেছে তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক। অথচ তাঁরাই করছেন চাকরির সুপারিশ, যা কেবল অনৈতিক চর্চাই নয়, দেশকে সামগ্রিক পিছিয়ে ফেলার বড় কৌশলমাত্র। কেন তাঁরা এই কাজ করেন?

এই প্রশ্নের সহজ উত্তর আর্থিক সুবিধা আর দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক দলের লোকবল বৃদ্ধি। যদিও অনেক সময় দেখা যায়, কেবল আর্থিক সুবিধার জন্য ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের তাঁরা সুপারিশ করে চাকরি পাইয়ে দেন। ফলে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগব্যবস্থা এতটাই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে সেখানে মেরুদণ্ডওয়ালা শিক্ষক খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ফরিদ খানের ফেসবুকের ‘স্টোরিতে’ চলে আসা শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ *ছবি: সংগৃহীত*

যখন যে দল ক্ষমতাসীন হয়েছে, তখন সেই দলই চেয়েছে তাদের সমর্থিত প্রার্থীদের শিক্ষক বানাতে। এমনও ঘটনা আছে, যে শিক্ষক যে বিভাগে হবেন, সেই বিভাগের কোনো ছাত্রনেতার সুপারিশপত্র সংগ্রহ করতে হয়, যা কতটা লজ্জার, অপমানের, তা ওই শিক্ষকেরাই জানেন। অথচ এই শিক্ষকেরা ক্ষমতা পাওয়ার আগে অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। আজ তাঁরাই ‘সুপারিশের কাছে’ নিজেদের মেরুদণ্ড ক্ষয় করে ফেলছেন।

এটা শুধু যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটছে তা নয়, সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নতুন প্রশাসন ‘শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী’ নিয়োগের ক্ষেত্রে এমন অভিযোগ উঠছে। বিষয়টি এমন দাঁড়িয়েছে, গত ১৫ বছর নিজেদের

দলের শিক্ষক/সহকর্মী পাননি, তাই নিজেদের আদর্শিক মানুষদের নিয়োগ দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সবাই। অন্য প্রার্থীর যোগ্যতা যতই ভালো হোক না কেন, ‘সুপারিশনামা’ পোক্ত হলেই নিয়োগবিধি সচল রাখছেন।

কিন্তু কেন এমন হবে? অরাজনৈতিক সরকারের সময়ে রাজনৈতিক নিয়োগ কেন বন্ধ হবে না? হ্যাঁ, এ কথা সত্য, গণ-অভ্যুত্থানের পর আপনাদের (উপাচার্যদের) নিয়োগ হয়েছে ‘দলীয় দৃষ্টিকোণ’ বিবেচনায়, এমন অভিযোগ দেখা গেছে সংবাদমাধ্যমে। ফলে নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় স্বার্থ রক্ষা হবে, সেটাই অনুমেয়।

তবে তাঁরা চাইলে এই নোংরা শৃঙ্খলটি ভেঙে ফেলতে পারতেন। কিন্তু সেটি না করে সগর্বে দাবি করা হচ্ছে, এমন সুপারিশনামা পেলেও নিয়োগ কার্যক্রমে কোনো প্রভাব ফেলে না। যদি প্রভাবই না ফেলে, তাহলে কেন এই ‘তদবির’কে প্রার্থীর অযোগ্যতা মনে করা হয় না? কেন আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয় না, প্রার্থীর সুপারিশপত্র থিসিস, পিএইচডি কিংবা গবেষণা অথবা বর্তমান কর্মস্থলের বস ছাড়া কেউ করতে পারবে না?

এগুলো বন্ধ করা না গেলে, মানসম্মত শিক্ষক যেমন পাওয়া যাবে না, তেমনি মেরুদণ্ডওয়ালা বিবেকবান শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চায় আসবেন না, পড়াবেন না। সেখানে আসবে কিছু দলান্ধ, চাটুকার মানুষ, যারা শিক্ষক নামের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে শিক্ষাটাকে ভাগাড়ে পরিণত করবেন। তাই সরকারের উচিত হবে, যেকোনো নিয়োগব্যবস্থায় ‘তদবির’ চর্চা বন্ধ করা, জাতীয় স্বার্থে আদেশ জারি করা।

- **ড. নাদিম মাহমুদ** গবেষক, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: nadim.ru@gmail.com

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো